BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04040022

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 04 | April 2026 | e-ISSN: 2584-1890

নবান্ন নাটকে সঙ্গীত প্রয়োগের পটভূমি : একটি অনুসন্ধান

Sandip Bar

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi, Email: sandipbar99@gmai.com

Abstract: *নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার প্রাচীন গ্রীক নাটকের কোরাস থেকে শুরু করে সংস্কৃত এবং আধুনিক বাংলা নাটক পর্যন্ত একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য বহন করে আসছে। উনিশ শতকে বাংলা থিয়েটার ইউরোপীয় আদর্শে গড়ে উঠলেও, দেশজ 'যাত্রা'র প্রভাবে এবং দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য মাইকেল মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ১৯৪৩ সালে বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা বাংলা নাটকে এক নতুন সমান্তরাল ধারার জন্ম দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং তেতাল্লিশের মন্বন্তরের পটভূমিতে বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' নাটকটি রচনা করেন। নাটকের প্রথম তিনটি অঙ্কে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের চরম ট্র্যাজেডি এবং মানুষের হৃতসর্বস্ব রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যকার কোনো প্রত্যক্ষ গানের ব্যবহার করেননি; নাটকের চতুর্থ অঙ্কে এসে যখন সর্বহারা মানুষ গ্রামে ফিরে পুনর্গঠন ও সঙ্ঘবদ্ধতার মাধ্যমে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে, তখন নাট্যকার তিনটি দৃশ্যে তিনটি বিশেষ গান (নিরঞ্জন, ফকির এবং কৃষক রমণীদের গান) সংযোজন করেন। এর মধ্যে ফকিরের গাওয়া গানটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং যৌথ প্রতিরোধের বার্তা দেয়, যা নাটকের মূল ভাবাদর্শকে ফুটিয়ে তোলে এবং এটি বাংলা নাটকে গণসঙ্গীতের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অভিনয়কালে সবকটি গানের প্রয়োগ না ঘটলেও, নাটকের অভ্যন্তরীণ গঠনে এবং বিজন ভট্টাচার্যের সাঙ্গীতিক প্রতিভার পরিচায়ক হিসেবে এই গানগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।*

Keywords: *নবান্ন, বিজন ভট্টাচার্য, গণনাট্য সঙ্ঘ, নাট্য-সঙ্গীত, গণসঙ্গীত, সঙ্ঘবদ্ধতা।*

Introduction: সঙ্গীতের সৃষ্টি নাটকের অনেক পূর্বে। সঙ্গীত এবং নাটক পৃথক শিল্পকলা হিসেবে পরবর্তীকালে দেখা দিলেও নাটকে সঙ্গীত একেবারে বর্জিত হয় নি। নাটক সঙ্গীতকে ত্যাগ করেনি, বরং সহযোগী করে নিয়েছে। সঙ্গীত নাটকের অন্যতম উপাদানে পরিণত হয়েছে। নাটক বস্তুনিষ্ঠ আর সঙ্গীত আত্মনিষ্ঠ। নাটক যৌথ শিল্পকলা, অন্যদিকে সঙ্গীত যৌথ এবং এককও। বরং একক শিল্পের চরিত্র সঙ্গীতে বেশি। দেখতে গেলে সঙ্গীত নাটকের উল্টো পিঠ তবে উল্টো হলেও নাট্য-শরীরের অঙ্গ হিসেবে সঙ্গীত থেকে গেছে, পরিত্যক্ত বা ছিন্ন হয়নি। প্রথা বা পরম্পরার মতো সঙ্গীত নাটককে অবলম্বন করে আছে। ভরত নাট্য-সঙ্গীতের বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রাচীনকালে বাদ্য ও নৃত্যকেও ব্যাপক অর্থে সঙ্গীত হিসেবে গণ্য করা হত। প্রাচ্য নাটকে সঙ্গীত অঙ্গ বা উপাদানের অন্তর্গত হয়ে আছে। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস্' গ্রন্থে নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগরীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি সঙ্গীতকে নাটকের একটি প্রধান 'অলংকরণ' (Embellishment) হিসেবে গণ্য করেছেন। গ্রীক নাটকে সমবেত সঙ্গীত বা কোরাসের আলোচনায় তিনি বলেছেন- "The Chorus too should be regarded as one of the actors; it should be an integral part of the whole, and take a share in the action -that which it has in Sophocles rather than in Euripides."[১]

গ্রীক নাটকের গোড়ার দিকে কোরাসের প্রাধান্য ছিল। পরে কোরাসের বিবর্তন ঘটল ও সংলাপের প্রাধান্য দেখা দিল। কোরাসের স্থানকে সংলাপ সংকুচিত করলেও কোরাস বর্জিত হল না। নাটকে তাই সঙ্গীত থেকেই গেল। গ্রীক নাটকের মত সংস্কৃত নাটকেও

সঙ্গীতকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কালিদাসের নাটকে সঙ্গীতের বিন্যাস সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। নাটকে সঙ্গীত প্রয়োগের এই ধারা অব্যাহত ছিল বিশ শতকের সমস্তটা জুড়ে। কালে কালে দেশে দেশে নাটকের বিবর্তনের নানা স্তরে নাটকে সঙ্গীতের নতুন নতুন প্রয়োগও শুরু হল। নাটকে সঙ্গীতের চরিত্র বদল হল। নাটকে সঙ্গীতের বিন্যাস ও প্রয়োগ তাই আমাদের কৌতূহলী করে তোলে।

Discussion: বাংলা নাটকের ঊষালগ্ন অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যকালেই নাটকের সঙ্গে সঙ্গীতের গাঁটছড়া বাধা শুরু হয়েছিল। সঙ্গীতবিহীন নাটক বাঙালি পক্ষে কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বাংলার যে দেশজ নাট্য-প্রকরণ 'যাত্রা' সেটিও ছিল সঙ্গীতনির্ভর। উনিশ শতকে বাংলা নাটক ইউরোপীয় আদর্শে গড়ে উঠলেও, বাঙালি জীবনে যাত্রার সংস্কার, সর্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। বিশেষত মঞ্চমুখী নাট্যকারেরা যাদের 'প্লে-রাইট' বলে চিহ্নিত করা যায়, তারা জনগণের মনজয়ের জন্য, তাদের রুচির রীতির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল হতেন। গান এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অঙ্গ গণ্য হয়। গানের একটা তীব্র আকর্ষণ আছে, মনোরঞ্জক ভূমিকা আছে। তাই বাংলার নাট্যকারগণ মাইকেল মধুসুদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখেরা তাঁদের নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগে ছিলেন অকৃপণ। তাঁরা তাদের নাটকের জন্য যেমন সঙ্গীত রচনা করেছেন, তেমন তার শিল্পীত ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাণশক্তিও নিহিত ছিল সঙ্গীতের মধ্যেই। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে সঙ্গীতের বহুল ব্যবহার দেখা যেত, বিশেষত স্বদেশী যুগে দর্শকের মনে স্বাদেশিকতার আবেগ সঞ্চারের স্বার্থে সঙ্গীতের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কালের পরিবর্তনে অনিবার্যভাবেই নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে, তবু আধুনিক জীবনধর্মী নাটকেও সঙ্গীত বর্জিত হয়নি। বিজন ভট্টাচার্য সেই আধুনিক নাট্যকারদের একজন যিনি তার নাটকে সঙ্গীত সংযোজিত করেছেন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভাব ঘটে গণনাট্য সঙ্ঘের। এই আবির্ভাবের দ্বারা বাংলা থিয়েটারে দেখা দেয় প্রচলিত নাট্যধারার সমান্তরাল আর একটি ধারা। পূর্বোক্ত ধারাতে ছিল পেশাদারী থিয়েটারের ধারা। এই ধারার নাটক প্রচলিত নাট্য শাস্ত্রের নির্দেশে রচিত হয়। সঙ্গীতের প্রয়োগকে এই ধারায় কখনই অবহেলা করা হয়নি। সঙ্গীতের মাধ্যমে নাট্য বিনোদনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রচলিত নাট্যধারার পাশে সমান্তরালভাবে আর এক নাট্য ধারার আবির্ভাব ঘটে। গণনাট্য সঙ্ঘ এই ধারার প্রবর্তক। এই ধারা অপেশাদারি শুধু নয়, রাজনৈতিক চিন্তায় পুষ্ট। বলা বাহুল্য, এই রাজনীতি বামপন্থী রাজনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর গণনাট্য সঙ্ঘতো প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ঐকান্তিক আগ্রহে। শোষিত জনগণের মুক্তির বাণী উচ্চারণই ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান চিন্তা। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল এই চিন্তার অন্তর্নিহিত অভীপ্সা। গণনাট্য সঙ্ঘ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশেষ করে বাংলা শাখা, তখন সেই শাখায় এসে সমবেত হন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতার পাশে অসংখ্য নাট্যশিল্পী, গায়ক-গায়িকা, নৃত্যশিল্পী। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা দেশের জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টির জন্য এই সব শিল্পীদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করেন। শিল্পীরা তাঁদের সঙ্গীত ও নাচের মাধ্যমে যেমন জনচেতনা পরিস্ফুটনের দিকে নজর দেন, সেই সঙ্গে লক্ষ্য থাকে এমন নাটক লেখার দিকে, যাতে সেই সব নাটক জনচেতনার জোয়ার প্রবাহিত করে দিতে তৎপর হবে।

গণনাট্য সঙ্ঘ স্থাপনের সময় বাংলার রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল যথেষ্ট উত্তাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিশেষ মাত্রা পায় তথাকথিত সোভিয়েত দেশ ১৯৪১ সালে জার্মানী কৃর্তক আক্রান্ত হলে। আক্রান্ত সোভিয়েত দেশ যোগ দেয় মিত্র শক্তিতে, যে শক্তির অন্যতম স্তম্ভ ব্রিটিশ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তখন আক্রান্ত সোভিয়েত দেশের সংকট ত্রাণের কথা প্রধান ভাবে চিন্তা করতে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে তাঁরা জনযুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। এই জটিল পরিস্থিতিতে মিত্র শক্তির অন্যতম শরিক হিসেবে ব্রিটিশের সঙ্গে সংঘাতে যেতে রাজি হননি তাঁরা। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে আহুত হল আগষ্ট আন্দোলন। বাংলার আকাশে তখন একের পর এক ঝড়। সেই ঝড়ের মধ্যে যথার্থই দেখা দিল ভয়ংকর সাইক্লোন। ঘর বাড়ি ভেসে গেল, গবাদি পশু প্রাণ দিল, মাঠের ফসল ধ্বংস হল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে এল মন্বন্তর। গ্রামের মানুষ দুমুঠো অন্ন, ফ্যানের আশায় ছুটল শহরে। সেখানে হয়তো লঙ্গরখানায় খাবার মিলবে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য ১৯৪৩ সালের ঐ সব ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দুর্গত মানুষের কাহিনী নিয়ে লিখলেন 'নবান্ন' নাটক। নতুন ধানের চাল থেকে তৈরি পায়েস পিঠে খেয়ে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গ্রাম-বাংলায়। গ্রামের মানুষ সব কিছু ভুলে মেতে ওঠে এই উৎসবে। এই উৎসব এককথায় মিলনোৎসব। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নবান্ন উৎসব আরও আনন্দঘন হয়ে ওঠে। 'নবান্ন' নাটকে তাই সঙ্গীত সংযোজন করেছেন নাট্যকার।

নাট্যবোধ যেখানে প্রেরণা, জীবনের সঙ্গীতের ব্যবহার নাট্য প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নাটকীয় চরিত্র ঘটনা ও পরিবেশ বর্ণনা, সংলাপ ও অভিনয়কে অর্থবহ করবার জন্য বা ভারাক্রান্ত দর্শকমনকে আনন্দ বিরতি (Dramatic Relief), নীতি উপদেশ প্রভৃতি দেবার জন্যও সঙ্গীতের ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু 'নবান্ন' গণনাট্য সংঘের পতাকা নিয়ে এমন একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব নিয়েছে, সেখানে প্রতিপাদ্য বিষয়টি মুখ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জাপানী আক্রমণ, ১৯৪২-এর আন্দোলনে উত্তাল এ দেশ, মহামারী-মন্বন্তর ও জলোচ্ছ্বাস, সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বভাবত নাট্যকারের শিল্পবোধ ও সংযম সঙ্গীতের বাহুল্যকে পরিহার করতে সচেষ্ট হয়েছে। নাটকটি সমস্যা কণ্টকাকীর্ণ বৃহত্তর জনসমাজ ও দেশের নানা ঘটনার সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলায় এতই নিবেদিত যে, প্রথম তিনটি অঙ্কের ১২টি দৃশ্যে সঙ্গীতের ব্যবহারের সুযোগই ছিলনা। যুদ্ধের জন্য গ্রামীন অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের জন্য সমাদ্দার পরিবার গ্রাম জীবন থেকে মন্বন্তর কবলিত শহরে আশ্রয় নিয়ে তার সঙ্কট ও আবর্তে বিব্রত ও হৃতসর্বস্ব হয়ে পরিশেষে ঘরে ফিরেছে। এর পরই একটু স্থিত হবার অবকাশ। বিজন ভট্টাচার্য কতকটা সমাদ্দারদের এই মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে ব্যঞ্জনাময় করবার জন্য এবং হয়তো কতকটা দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য, চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্যেই গান সংযোজন করেছেন।

নবান্ন নাটকের প্রথম তিনটি অঙ্কে কোনো সঙ্গীত থাকার কথাও নয়। কারণ প্রথম তিনটি অঙ্কে শুধুই দুর্গতির করুণ দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। ভারতছাড়ো আন্দোলনে গৃহহারা নারী-পুরুষ গান গাইবার কথা ভাবতেই পারে না। পুলিশের গুলির ভয়ে কাতর মানুষ বনে-জঙ্গলে নির্বাসিত জীবনযাপন করছে। আবার স্বাধীনতাকামীদের মিছিলের দর্পিত পদক্ষেপও শোনা যাচ্ছে। মরণজয়ী এইসব মানুষ সঙ্গীতে সঙ্গীতে মেতে ওঠেনি। কিন্তু প্রধান সমাদ্দারের সংলাপে ফুটে উঠেছে উদ্বেল মথিত আবেগাপ্লুত বাণী— "শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেবরে কুঞ্জ। আমি প্রাণ দেব।"[২]

—এই গদ্য সংলাপ তো স্বাধীনতা যোদ্ধার প্রাণ মাতানো সঙ্গীত। পঞ্চাননী মিছিল পরিচালনা করতে গিয়ে পুলিশের ছোঁড়া গুলিতে আহত হয়ে পড়ে যায়। কিন্তু হাতে তার উড়তে থাকে জাতীয় পতাকা। আর তার মুখে শোনা যায়— "এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব। এগিয়ে যা।"[৩]

পঞ্চাননী জীবন দিয়েছে, কিন্তু তার 'এগিয়ে যা তোরা' শুনে সঙ্গীতের সুরে মেতে উঠেছিল মিছিলের মানুষ। বিয়ে বাড়ির দৃশ্যে অভুক্ত শীর্ণ প্রধান দু হাত তুলে গৃহকর্তার উদ্দেশ্যে কাতর কণ্ঠে বলেছিল— "ও বাবারা-বাবু কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটারে এক মুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু। বাবু তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু।"[৪]

—প্রধানের মুখের ঐ কথা বেদনার অশ্রুলিপি, দুঃখের সঙ্গীত। নবান্নের বিভিন্ন দৃশ্যে শোনা গেছে 'মাগো মাগো' ধ্বনি। এই ধ্বনি শোনা গেছে চরম বৈপরীত্যের মুহূর্তে। যখনি খাদ্যের অপচয়, কালোবাজারীর উল্লাস, মতলববাজের দূরভিসন্ধি মাত্রা ছাড়াচ্ছে, তখনিই নাট্যকার 'মাগো মাগো' ধ্বনির উল্লেখ করেছেন। এ যেন দুঃখ-সঙ্গীতের ধ্রুবপদ। নাটকের প্রথম তিনটি অঙ্কে প্রত্যক্ষভাবে সঙ্গীতের প্রয়োগ করা হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন চরিত্রের ব্যথা বিদীর্ণ সংলাপে এবং মাঝে মাঝে 'মাগো মাগো' ও 'বল হরি হরি বোল' ধ্বনির প্রয়োগ সঙ্গীতের প্রতি নাট্যকারের বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছে।

বিজনের সাঙ্গীতিক প্রতিভার স্বাক্ষর মিলবে নবান্ন নাটকের চতুর্থ অঙ্কে। এই অঙ্কের তিনটি দৃশ্যেই তিনটি সঙ্গীত সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে সঙ্গীতগুলি গেয়েছে যথাক্রমে নিরঞ্জন, ফকির ও কৃষক রমণীরা। নিরঞ্জন তার স্ত্রীকে নিয়ে আমিনপুরের পড়ো ভিটেতে ফিরে এসে নতুন করে ঘর বানিয়েছে। তার গৃহপ্রাঙ্গণে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান চাষীদের সভা বসেছে। কেমন করে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় তার চিন্তায় তারা ব্যস্ত থেকেছে। গাঁতায় খাটা এবং ধর্ম গোলায় ধান তোলার ব্যবস্থা পাকা হবার আনন্দে নিরঞ্জন ও তার বউ পরম নিশ্চিন্ততা অনুভব করে। সভা থেকে এসে সন্ধ্যায় নিরঞ্জন তার ঘরের দাওয়ায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। তার স্ত্রী বিনোদিনী উনুনে ভাত চড়িয়ে দেয়। নিরঞ্জন শুয়ে শুয়ে গান গেয়ে ওঠে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি—

"বড় জ্বালা বিষম জ্বালায়
পুড়ে পুড়ে হবো সোনা,
সে কথা তো মিথ্যে হল

হলাম অনুপায়।
দুখের দাহন সুখের আসন
বিজ্ঞজনের হক্ কথা,
শুনে এলাম এই তথ্য
চলতি পথের একতারায়।
হলাম নিরুপায়॥"[৫]

—এখানে প্রকাশ পেয়েছে নিরঞ্জনের মনের ক্ষোভ ও বেদনা। স্বজন হারানোর বেদনা যেমন প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত, তেমনি মানুষের মিলিত হওয়ারও প্রয়াস আছে। বিষম জ্বালায় জ্বলে পুড়ে সে নিখাদ হয়েছিল। কিন্তু তার জীবনে ঘটল বিপরীত ঘটনা। জীবনপথের পরিক্রমায় দুঃখ ও সুখের চাকা একের পর এক ঘুরতে থাকে। এই চরম সত্য জীবনে ফলতে চলেছে। কিন্তু আপনজন হারার বেদনা তো তার ভোলা হল না। একদিন সে অভাবকে জয় করার বাসনায় ঘর ছেড়েছিল। স্ত্রীর কান্না দেখে তার দাদা কুঞ্জ তাকে চেলা কাঠ দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেছিল। তারপর কুলির চাকরি নিয়ে সে আপনজনের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে ছিল। তারপর ঘটনাচক্রে স্ত্রীকে ফিরে পেলেও এখনও ফিরে পায়নি তার জ্যেঠা, দাদা ও বৌদিকে। দুঃখের ঘটনা তার মনের মধ্যে বিরাজমান। সে জেনেছে দুঃখের পর আসবে সুখ। এই সুখের স্বপ্নে সে এখন বিভোর। সঙ্গীতটি সেই স্বপ্ন বিভোরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সুখের স্বপ্ন সার্থক হবে তার পরিবারের আপনজনদের আগমনে। সঙ্গীতটির শেষে দেখা গেছে কুঞ্জ সস্ত্রীক এসে হাজির তাদের ফেলে যাওয়া বাড়িতে। এখানেই সঙ্গীতটির নাট্য-তাৎপর্য স্পষ্ট হয়। উল্লিখিত এই সঙ্গীতটি মিলনোৎসবের আগাম ঘোষণা করেছে। গানটি গণসংগীতের পর্যায়ে পড়লেও গভীরভাবে নাট্যতাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের ফকিরের সঙ্গীতটির নাট্যপ্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। মন্বন্তর শেষ হয়েছে। যারা গ্রাম ত্যাগ করে যায়নি তারা যে যার জমিতে চাষ করেছে। যারা গ্রাম ত্যাগ করে গিয়েছিল তারাও একে একে ফিরে এসেছে। নিরঞ্জনের বাড়ির উঠোনে অনুষ্ঠিত গ্রাম সভায় স্থির হয় সবাই গাঁতায় খেটে ধান কাটবে। শেষে সেই ধান ঝাড়াই করার পর ধর্ম গোলায় তুলবে। সিদ্ধান্ত মতো যখন ধর্ম গোলায় ধান তোলা হয়েছে, তখনই গায়ে ঢিলে আলখাল্লা পরা এক ফকির প্রবেশ করে। হাতে তার সাদা চামর, সঙ্গে দুজন দোহার -তারাও ফকির। তারা এসেই গান জুড়ে দিল—

"আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান।
হিন্দু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।"[৬]

সঙ্গীতটি খুব দীর্ঘ- ৩০টি পংক্তি বিশিষ্ট। উল্লিখিত পঙক্তি দুটি ধুয়া। ফকিরকে মনে হবে বাংলার প্রচলিত যাত্রা দলের বিবেক রূপে। সঙ্গীতের পংক্তিগুলিতে উচ্চারিত হয়েছে সতর্কবানী। গ্রাম-বাংলার অসহায় চাষীরা যদি বাঁচতে চায় তবে তাদের ভুলতে হবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ব্যক্তি স্বার্থপরতা। এই দুটি নিষেধ সম্পর্কে সচেতন না হলে যে যথার্থ প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়, সেই কথায় ফকির তার সঙ্গীতে ব্যক্ত করেছে। ফকির বলেছে—

"এ ছাড়া আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।
আজও যদি শিক্ষা না হয় শিক্ষা হবে কবে॥"[৭]

—বাঙালীর উপর দিয়ে বয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভেদ জনিত নানা অনৈক্য। চরম বিপদের দিনে এইসব বিভেদ ভুলতে হবে।

ফকির তার সঙ্গীতে জনৈক জব্বর মিঞার কথা বলেছে। সেই অন্যায় দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে প্রাণ হারায়। গ্রামের মানুষের দুঃখ ও দুর্গতির নানা চিত্র ফকির তার সঙ্গীতে ব্যক্ত করেছে। কালান্ত আকালের কবলে পড়ে কত চাষী প্রাণ দিয়েছে, গরু-বাছুর মারা গেছে, লাখ লাখ নারী শিশুর প্রাণ নিঃশেষিত হয়েছে, ঘরের বউ উধাও হয়ে গেছে জঠরের জ্বালায়, জঘন্য বৃত্তি গ্রহণ করেছে, বাচ্চা শিশু মায়ের বুকের দুধ না পেয়ে মারা গেছে, এরশাদের বউ লজ্জা নিবারণের জন্য কবর খুঁড়ে কাপড় জোগাড় করেছে। যাঁরা বেঁচে আছে, তারা যেন জীবন মৃত। অনশনে অপমৃত্যুর গ্রাসে পড়েছে তারা। একে ফকির বলছে জীবনের দায়। মাঠে মাঠে

এখন পাকা ধান। চোখের জল নিবারণ করে কেমন করে সেই ধান তোলা যায়, সেই চিন্তাই বড় হয়ে দেখা দিক। পড়ে পড়ে মার খাওয়া তো ফকিরের ভাষায় জীবনের প্রহসন। তাই ফকির বলে—

"এ জীবনের প্রহসনে কী বা বল ফল।
বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল।"[৮]

—হতাশা দূর করতে হবে। সাহস সঞ্চয় করতে হবে। আমন ফসল শুভ লক্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে। গাঁতায় খেটে সেই ফসল ঘরে তুলতে হবে। ফকির স্পষ্টই বলে-

"ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্বার্থ সিদ্ধি গৃহস্থের হয়।
ছোট মুখে বড় কথার এই মর্ম হয়॥"[৯]

সঙ্গীতের শেষে ফকির তার সঙ্গীতে নিজেকে ছোট মানুষের সঙ্গে তুলনা করলেও, তার সঙ্গীত উপযুক্ত সময়ের উপযুক্ত উপায় অবলম্বনের কথা ঘোষণা করেছে। এই সঙ্গীত শুনেছে গ্রামবাসী যখন তারা ধর্ম গোলায় ধান তুলেছে। এই সময় দরকার চরম ঐক্যের। তাতেই 'জীবনের প্রহসন' দূর হবে।

এই সঙ্গীত কিন্তু একক মানুষের বেঁচে থাকার স্বপক্ষে ওকালতি করেনি। এই গানের মহিমা ব্যক্ত হয়েছে সমবেতভাবে সংঘবদ্ধতার আদর্শে বেঁচে থাকার প্ররোচনায়। 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' -এটি নিতান্ত সংকীর্ণ চেতনা। এর থেকেই আসে বিচ্ছিন্নতা, আর বিচ্ছিন্নতার আদর্শ নিয়ে সমাজ প্রগতির পথে এগোতে পারে না। প্রগতির লক্ষ্যে চলতে গেলে চাই সঙ্ঘবদ্ধতা। বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেই জন্ম দেয় এই সঙ্ঘবদ্ধতার। গানটি তারই ইঙ্গিত দেয়। নবান্ন নাটকের মূল কথা ব্যক্ত হয়েছে ফকিরের এই সঙ্গীতে। গ্রামীণ সুরে রচিত সঙ্গীতটি যথার্থই গণসঙ্গীতের ধারণার জন্ম দেয়। নবান্ন যে গণনাট্যের পর্যায়ভুক্ত, তা এই সঙ্গীতের মাধ্যমে জানা যায়। এই সঙ্গীতটির স্বরলিপি স্বয়ং করেছেন নাট্যকার। তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার এ এক মূল্যবান স্বাক্ষর।

নবান্নর চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের সঙ্গীতটি গেয়েছে কৃষক রমণীরা। সঙ্গীতটি নিম্নরূপ—

"নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি
ডুরে শাড়ি পাছাপাড় আর হার সাতনলি।
কনে দেখা আলো মেখে আসবে বঁধু আল বেয়ে
দেখে হেসে সরি যাবি কথা না কয়ে॥"[১০]

—নতুন ধানের সুবাসে এখন আমিনপুর গ্রাম ম-ম করছে। চারিদিকে প্রাণের স্পন্দন। নতুন জীবনের উল্লাসে সবাই মাতোয়ারা। এই আনন্দ মুখর পরিবেশে কৃষক রমণীরা দল বদ্ধভাবে পা ছড়িয়ে দিয়ে পান মুখে দিয়েছে। তাদের সাজগোজের ঘটা চোখে পড়ার মত। তাদের সবার কপাল তৈলাধিক্যে চক চক করছে। কলমুখর এই রমণীদের সঙ্গীতে শোনা গেছে জীবন বসের উৎফুল্লতা। এখন ধান উঠেছে। সচ্ছল দিনের শুরু হয়েছে। হাসি আর আনন্দের মুহূর্ত ভরে উঠুক স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া উপহারে। সম্পন্ন গৃহকর্তার কাছ থেকে তারা চাইবে গলার হাঁসুলি ডুরে পাছাপাড় শাড়ি আর সাতনলি হার। প্রাণের বন্ধু যখন ঘরে আসবে আল বেয়ে তখন হাসির রহস্য ছড়িয়ে দেবে রমণীরা। নবান্নর উৎসব মেতে ওঠে নবজীবনের উল্লাসে। গানের শেষে লাল ঝুঁটিওয়ালা মোরগের ছটফটানির মধ্যে দিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদের চিত্রও ফুটে উঠেছে।

Conclusion: নবান্ন নাটকে চতুর্থ অঙ্কেই শুধু সঙ্গীতের প্রয়োগ হয়েছে। এই অঙ্কেই প্রতিরোধের সম্মিলিত মনোবল প্রকাশিত হয়েছে। এই মনোবলই মনের আনন্দের সন্ধান দিয়েছে। সঙ্গীত সেই আনন্দ থেকেই উৎসারিত হয়েছে। মুদ্রিত সংস্করণের ১৫ টি দৃশ্যের পরিবর্তে মোট ১৪ দৃশ্যে নাটক অভিনীত হত। ফকিরের গানটি মূল দৃশ্যকে প্রায় সব বাদ দিয়ে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কৃষকদের সভাশেষে এবং কুঞ্জ-রাধিকার ঘরে ফেরার আগে গাওয়া হত। নিরঞ্জনের গান 'বড় জ্বালা বিষম জ্বালা'- কোনদিনই গাওয়া হয়নি। এমনকি শেষ দৃশ্যে কৃষক মহিলাদের গান দু'একদিন গাওয়া হলেও পরে পরিত্যক্ত হয়। এর থেকে এটি স্পষ্ট যে,

অভিনয়কালে 'আপনি বাঁচলে' গানটি ছাড়া অন্য দুটি গানের নাট্যোপযোগিতা বস্তুত স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু তার জন্য নাটকেরর সঙ্গীতগুলির গুরুত্ব কমে যায়নি। বিজন ভট্টাচার্য্য যে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন সে কথা স্বীকার করেছেন কবি অরুণ মিত্র তাঁর একটি স্মৃতিচারণমূলক লেখায়— "আমি নাট্যের চেয়ে সঙ্গীতে তাঁর (বিজনের) ক্ষমতার বেশী অনুরাগী ছিলাম এবং আমার দৃঢ় ধারণা নাটকের মতো সঙ্গীতে নিজেকে নিয়োজিত করলে সে এক্ষেত্রেও নতুন পথ খুলে দিতে পারত।"[১১]

Reference:

(১) Bywater, Ingram. (1920). Aristotle on The Art of Poetry, Clarendon Press, P. 65-66

(২) ভট্টাচার্য, বিজন। (২০০৪)। নবান্ন, দেজ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ৪৫

(৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৯

(৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬২

(৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৭২

(৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৮

(৭) পূর্বোক্ত

(৮) পূর্বোক্ত

(৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৯

(১০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১২

(১১) মিত্র, অরুণ। (১৯৭৮)। পরিচয় পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ২৭

Citation: **Bar. S.,** (2026) "নবান্ন নাটকে সঙ্গীত প্রয়োগের পটভূমি : একটি অনুসন্ধান", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-04, April-2026.